ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম সনদ অনুসারে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার ও সুযোগ লাভ করে। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক অধিকার লাভের পূর্বে সমস্ত ইংরেজ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে কোম্পানির সঙ্গে কোনও প্রকার বাণিজ্য অধিকার মুক্ত নয়, এই নীতি প্রযোজ্য ছিল। ভারতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভাবে কর্তৃত্ব স্থাপনের পরে ভারতীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্র থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার অন্য ইউরোপীয় প্রতিযোগিদের যথা, ওলোন্দাজ ও ফরাসি বণিকদের বিতাড়িত করে। এর পর এই প্রতিযোগী দেশদ্বয়ের বণিকদের ক্ষেত্রে ভারতীয় দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করাও বন্ধ হয়। ফলত ইংরেজ বণিকরাই বাণিজ্য ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার লাভ করে। কোম্পানির কর্মচারীদের অনেকেই বিবিধ প্রকার বাণিজ্যে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীদের এই প্রকার ব্যক্তিগত

বাণিজ্য কোম্পানির ইংল্যাণ্ডস্থিত কর্তৃপক্ষের মন মতো না হবার ফলে ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলাদেশের গভর্নর হিসেবে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁকে এ সময় বাংলার যাবতীয় ব্যক্তিগত বাণিজ্য রোধ করার আদেশ দেন ব্রিটিশ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু ক্লাইভ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় নির্দেশ অমান্য করেন। তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের যাবতীয় বাণিজ্য যথা প্রকাশ্যে ও ব্যক্তিগত ভাবে চালাতে প্রয়োজনীয় প্রশ্রয় প্রদান করেন। কিন্তু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী ক্লাইভ কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য করতে নিষেধ করেন। এই সমস্ত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য তিনি একটি যৌথ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নির্ণয় করেন, যে প্রতিষ্ঠানের উপর সুপারি, লবণ এবং তামাকের একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করা হয়। কিন্তু কোম্পানির ইংল্যাণ্ডস্থিত ডিরেক্টর সভা ভারতবর্ষের কোম্পানির কর্মচারীদের এই অবাধ ব্যক্তিগত বাণিজ্য বন্ধ করার নির্দেশ প্রেরণ করে। ক্লাইভ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন। ফলত ভারতবর্ষে কোম্পানির কর্মচারীবৃন্দ আরও দুই বছর অবৈধ ভাবে তাদের অন্তর্বাণিজ্য বজায় রাখে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব ঘটে। এই শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচলন হয়। এই সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থে প্রয়োজন হয় বৃহৎ বাজারের। কিন্তু এক দিকে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অন্য দিকে নেপোলিয়ানের যুদ্ধ। এই যুদ্ধের কারণবশত আমেরিকা ও ইউরোপের বাণিজ্যিক বাজার সাময়িক ভাবে ইংল্যাণ্ডের কাছে বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যাণ্ডে শিল্পপতি ও অর্থনীতিবিদগণ ভারতের কোম্পানির যে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার ছিল তার বদলে তারা অবাধ বাণিজ্যের দাবি করেন। এ সময় ভারতে কোম্পানির রাজনৈতিক আধিপত্য দৃঢ় ভাবে স্থাপিত হয়। ফলত শাসনতান্ত্রিক ও বাণিজ্যিক উভয় দিক কোম্পানির পক্ষে সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। আবার ভারতের আধিপত্য বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন খাতে যথা—যুদ্ধ পরিচালনা, সাম্রাজ্য রক্ষা, শাসনকার্য পরিচালনা প্রচুর ব্যয় করতে হয়, ফলে কোম্পানি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এই ঋণের হার অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে, কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী এই ঋণ পরিশোধে অপারগ হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে, কোম্পানির সনদ পুনরায় মঞ্জুর করা হয়। ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে এবং কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের ব্যবস্থা বন্ধ করার দাবি প্রবল হয়ে ওঠে। একমাত্র চিন সাম্রাজ্যে কোম্পানির বাণিজ্য অধিকার বজায় থাকবে সনদ অনুযায়ী এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়। ভারতীয় বাণিজ্যের এ সময় থেকেই ইউরোপীয়দের কাছে সম্পূর্ণ ভাবে

উন্মুক্ত করা হয় ভারতে বিদেশিদের বসবাসের জন্য। পূর্বে যে সমস্ত বিধি নিষেধ ছিল এ সময় থেকেই তা বন্ধ হয়ে যায় এবং ইংল্যাণ্ডের প্রতাপশালী ব্যক্তিরা এ সময় ভারতে ভারতীয় অর্থনীতি ও শিল্প ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ করতে শুরু করে।

বাণিজ্যের নতুন ধারা: ভারতবর্ষে কোম্পানির অবাধ বাণিজ্য নীতি গৃহীত হয়। এর ফলে ইংল্যাণ্ড ভারত সম্পর্কে নতুন আভাস পাওয়া যায়। এই সময় থেকেই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ জাত দ্রব্য সামগ্রী ইংল্যান্ডে থেকে আমদানি হতে থাকে। কিন্তু এই আমদানিকৃত দ্রব্য সামগ্রীর উপর কম হারে শুল্ক ধার্য হবার কারণে এবং ইংল্যাণ্ড থেকে ব্যাপক হারে বিদেশি দ্রব্য ভারতে আমদানিকৃত হবার ফলে ভারতীয় সূতিবস্ত্র শিল্প ব্যাপক হারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই সময় ভারতীয় দ্রব্য সামগ্রীর উপর ব্যাপক হারে শুল্ক ধার্য হবার ফলে ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পায়। ফলে ভারতীয় বাজারে ব্রিটেন জাত দ্রব্য পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং ভারতীয় শিল্পগুলি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সাম্রাজ্যের দিকে কোম্পানি ভারতীয় দ্রব্যসামগ্রী আমদানির ব্যাপারে বিশেষ সামগ্রী না পাওয়ায় পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে মসলা, সূতিবস্ত্র প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপের অন্যান্য স্থানে রপ্তানি করত। এই সময় ইংল্যাণ্ডে পশমজাত দ্রব্যাদির চাহিদা বাজারে ছিল না এবং ইংল্যাণ্ডের নিজস্ব শিল্পগুলিও ছিল বেশ নিম্নমানের। ফলে ইউরোপীয় বণিকরা ভারতীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করত এবং তার পরিবর্তে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্যজাত মুদ্রার ভারতে আমদানি ঘটত। এরপর বিশেষত পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধ পরবর্তী কালে ভারতে কোম্পানি যখন সম্পূর্ণ ভাবে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন করে তখন স্বল্প মূল্যে বেশি পরিমাণে ভারতীয় দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করা কোম্পানির কাছে সহজ হয়ে ওঠে। এ সময় বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োগের অপব্যবহারে কৃষক ও তন্তুবায় গোষ্ঠীর উপর অবাধ ও কঠোর শর্ত আরোপ করে তাদের কাছ থেকে বলপূর্বক দ্রব্য সামগ্রী আদায় করা হতে থাকে এবং এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি বাংলার সঙ্গে সমগ্র ভারতে অনুসৃত হয়।

ইউরোপে সুতি ও রেশম জাত শিল্প সামগ্রীর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকার ফলে ভারতের রপ্তানিজাত দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে এই দু'টির চাহিদা ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি এবং এই কারণে এই জাতীয় চাহিদামূলক পণ্য সামগ্রী উৎপাদনের জন্য কৃষক ও তন্তুবায়দের উপর অবাধে অত্যাচার চলত।

যেহেতু কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনও ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কাছে এই কৃষক ও তন্তুবায়রা কাজ করতে পারত না, তাই সেই ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা কোম্পানির কর্মচারীরা কৃষক ও তন্তুবায়দের কারখানায় আটকে রাখত। অধিক

কাজ করিয়ে কখনও এদের স্বল্প পারিশ্রমিক দিত, আবার কখনও বা কিছুই দিত না। সারা বছর নিয়মিত ভাবে সূতি বস্ত্রের সরবরাহের জন্য অকথ্য অত্যাচার দ্বারা তন্তুবায়দের আগাম চুক্তি স্বাক্ষর করাতো। যে সমস্ত কৃষক কাঁচা রেশম উৎপাদন কার্যে যুক্ত থাকত তাদের সঙ্গে একই ব্যবহার করা হতো। এতে ভারতীয় কৃষক ও তন্তুবায় সম্প্রদায় সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। এর পরবর্তী পর্যায় অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে বিশেষত লিভারপুল, গ্লাসগো প্রভৃতি স্থানে বয়ন শিল্পের প্রচুর কারখানা তৈরি হয়। ব্রিটেন, আমেরিকা সুসম্পর্ক থাকার ফলে ইংল্যাণ্ডের বণিকরা সুলভে প্রচুর পরিমাণে তুলা আমদানি করতে সমর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যাণ্ডে তুলাজাত শিল্প সামগ্রীর ব্যাপক উৎপাদনের সঙ্গে বয়ন শিল্পের উৎকর্ষতা দেখা দিলে ইউরোপীয় বণিকরা ভারত থেকে সূতি ও রেশম জাত বস্ত্র আমদানি রদ করতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এ সময় ইংল্যাণ্ডের তুলাজাত পণ্য সামগ্রীর ভারতীয় বাজার দখলের জন্য ইউরোপীয় বণিকরা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে নানা প্রকার দাবি ও আর্জি পেশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে বিবিধ আইন প্রণনয়ের মাধ্যমে ভারতীয় বয়ন শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর উপর উচ্চ হারে আমদানি শুল্ক ধার্য করা হয়। ভারতীয় সূতিবস্ত্র ব্যবসায়ীদের এবং উৎপাদনকারীদের কাছে ইংল্যাণ্ডের বাজার সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এবং এর সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকগণ স্বল্প মূল্যে চিন দেশ থেকে কাঁচা রেশমজাত দ্রব্য ক্রয় করে স্বদেশে প্রেরণ শুরু করলে ইংল্যাণ্ডের বাজারে ভারতীয় রেশম বাজারও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সূতি ও রেশম জাত দ্রব্য সামগ্রী ব্যতীত ইংল্যান্ডে রপ্তানিকৃত দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল শোরা। বিহার এবং উত্তর প্রদেশের বিবিধ স্থানে বারুদ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় শোরা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। ইউরোপীয় বণিক ব্যতীত ওলোন্দাজ, পর্তুগিজ বণিকরাও প্রচুর পরিমাণ শোরা ক্রয় করত। কিন্তু ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতে শোরা ক্রয়ের অধিকার একচেটিয়া ভাবে ইংরেজরা লাভ করায় ও শোরার সর্বোচ্চ মূল্য স্থিরীকৃত হবার ফলে ভারতীয় শোরা বিক্রেতারা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

অর্ন্তদেশীয় বাণিজ্য: ভারতে তথা বাংলায় রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক আধিপত্য স্থাপনের ফলে বাংলা তথা ভারতের অন্তর্দেশীয় বাণিজ্য কোম্পানি কুক্ষিগত করে। এই অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যাপক দুর্নীতি ও দস্তকের অপব্যবহারের কারণে প্রথমে সিরাজ ও পরে মীরকাশিমের সঙ্গে দ্বন্দ্বের সূচনা হয়। কিন্তু এতে কর্মচারীবৃন্দ নিরুৎসাহিত হবার পরিবর্তে দ্বিগুণ উৎসাহে বাংলাদেশে

ব্যক্তিগত অন্তর্বাণিজ্য শুরু করে এবং অল্প কালের মধ্যে এই ব্যবসা বিশাল আকার ধারণ করে। এ দিকে দেশীয় বণিকদের উচ্চ হারে শুল্ক প্রদান ব্যতীতও নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয়। কৃষক ও তাঁতিদের কাছ থেকে দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়ের একমাত্র অধিকার কর্মচারীরা লাভ করে। নিত্য প্রয়োজনীয় বাঁশ, সুপারির মতো সাধারণ সামগ্রীও ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হয়।

কোম্পানির কর্মচারীরা যাবতীয় নিত্য প্রয়োজনীয়ও সুলভ মূল্যের দ্রব্যাদি পূর্বে এক করে ও পরে তার উপর উচ্চ শুল্ক ধার্য করে সেটি ভারতীয়দের ক্রয় করতে বাধ্য করে এবং এই ক্রয়ের জন্য অত্যাচারের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করলে ভারতীয় কারিগর, বণিক, শিল্পী নিজস্ব ক্ষেত্র পরিত্যাগ করে কৃষিজীবীতে পরিণত হয়। এর ফলস্বরূপ উভয় প্রকার বাণিজ্যে যথা বহির্বাণিজ্যে ও অন্তর্বাণিজ্যে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপিত হয়।

বাণিজ্যের প্রকৃতি বা চরিত্র: ভারতে সনদ দ্বারা প্রাপ্ত রাজনৈতিক অধিকার লাভের পর এর দ্বারা ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারতে অর্থনৈতিক অধিকার কায়েম করতে বদ্ধ পরিকর হয়ে ওঠে। যার জন্য ভারতীয় শাসকবর্গের পূর্ণ সহায়তা বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হয়। এর পর শাসকবর্গের সাহায্যে ইউরোপীয় বণিকরা রপ্তানিজাত পণ্য তাদের উৎপাদন কৌশলকে ছয় ভাগে নিয়ন্ত্রণ করতে সচেষ্ট হয়। ফলত ভারতীয় রপ্তানিজাত দ্রব্য সামগ্রী যেমন এক দিকে ইউরোপীয় বণিকদের কুক্ষিগত হয় তেমনি অন্য দিকে তারা স্বল্প ব্যয়ে অধিক লাভের অধিকারী হয়।

এই ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর এই জাতীয় কার্যাবলির জন্য ভারতীয় সম্পদ নির্গমনের পথ সুগম হয়। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্রে আধিপত্য স্থাপনের ফলে অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যায়।